সৌজন্যেঃ **স্বস্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল**

পারিবারিক মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

অ্যাঞ্জেল

আপনার স্বাস্থ্য ও মননের সঙ্গী

ছোটদের শিক্ষনীয় মনোরঞ্জন অনুষ্ঠান

কলকাতা, অক্টোবর সংখ্যা, ১লা অক্টোবর, ২০১৯, ১৩ই আশ্বিন, ১৪২৬ মঙ্গলবার, একাদশতম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪ পাতা, মূল্য ৪ টাকা

মনের রোগ বলে ... - ৩-এর পাতায় ✸ গারুচিরা ভ্রমণ - ৪-এর পাতায় ✸ শিশুর মোবাইল প্রীতি - ৬-এর পাতায়

মানসিকভাবে সুস্থ থাকাটা জরুরী

মানসিক রোগ শুধু প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষেরই হতে পারে এমন ধারণা কম বেশি আমাদের মধ্যে আছে। আর তাই রাস্তায় পাগল দেখলে ঢিল ছোঁড়া বা তার অবুঝ হওয়ার সুযোগ নিয়ে তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, আমাদের মতো দেখতে সাধারণ মানুষ, যারা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে অফিসে যায়, সংসার চালায়, বাড়ির কাজ করে সঙ্গে এমন ধরণের চিন্তা ভাবনাও করে, তারাও আদপেই মানসিক ভাবে অসুস্থ। অদ্ভুত শোনালেও এটিই সত্যি কথা। একজন খুনি যেমন মানসিকভাবে অসুস্থ, ঠিক তেমনি যে ছেলেটি বয়স্ক বাবা মাকে মারধর করে সেও মানসিকভাবে অসুস্থ। আবার রাস্তায় ঘুমন্ত কুকুরকে যে অকারণেই মারে সেও মানসিকভাবে অসুস্থ। মানসিক অসুস্থতার সাথে বড়লোক বা গরিব লোকের কোনো সম্পর্ক নেই।

মানসিক সমস্যা হল মানসিক শান্তি ও স্থিরতার অভাব। যা প্রায় একটি জলজ্যান্ত মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।

২০১৯ সালে সোশ্যাল মিডিয়ার চূড়ান্ত ব্যবহারের মাঝে যেখানে দূরত্ব নিজের অস্তিত্ব হারাচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র বয়স্করাই নয়, মানসিক রোগে বা মানসিক অস্থিরতার শিকার টিন-এজাররাও। আর এই সমস্যা এতটাই জটিলতর রূপ ধারণ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক সুস্থতা প্রশ্নের সম্মুখীন।

ভারতের মতো দেশে মানসিক অসুস্থতা আদপেই কি বা সেটা কেমন হয় তা অনেকেই বোঝে না। ফলে যখন অনেক ছোট বয়সে, একটি শিশুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় – 'বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে' এই ভেবেই থেমে যাওয়া হয়। ফলে জিনগত কারণেই হোক বা পরিবেশের প্রভাবে মানসিক ভাবে অসুস্থ এইটাই কেউ বুঝতে পারে না। তাই সময় মতো সঠিক চিকিৎসাই হয় না। শরীরের কষ্ট বলা গেলেও মনের কষ্ট একজন মনোচিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানো অসম্ভব, এটা সবাই বোঝে না।

প্রতি বছর ১০ই অক্টোবর 'ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে' পালন করা হয়। এই দিন মানসিক সমস্যার বিভিন্ন দিক আর সব থেকে বড় বিষয় মানসিক সমস্যার উপস্থিতি একজন সাধারণ মানুষের জীবনে কি বড় অভিশাপ, সেই ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। মানসিক সমস্যা সবসময় খোলাখুলি আলোচনা করাটাই কাম্য, কিন্তু কথা বলার পরিবেশ বা সমাজের কথা ভেবে আমরা অনেকেই হয়তো এই বিষয় কথা বলতে পারি না। আর তাই প্রয়োজন একটি কথা বলার পরিবেশ, যা সব সময় একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই দরকার সরকারের হস্তক্ষেপ। ২০১৯-এর 'মেন্টাল হেলথ ডে' উদ্‌যাপনের বিষয় মানসিক অসুস্থতার সমস্যায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যাতে তারাও সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে এবং মানসিকভাবে সুস্থ এক সমাজ গড়তে পারে। তবে সুস্থ মানসিকতা হওয়ার দরুন আমাদেরও দায়িত্ব চেনা মুখগুলোর মানসিক সুস্থতার দিকে নজর দেওয়া।

সম্পর্কের টানাপোড়েন

"যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায় নয়জন..."

পুঁথিগত বিদ্যায় বড়ো হলেই তো আর হলো না সেই সঙ্গে মানুষের মতো মানুষ হওয়াটাও খুব জরুরী। আর তারই পাশাপাশি আমাদের আশেপাশে থাকা মানুষজনদের সঙ্গে সম্পর্কগুলিকেও সম্মান সহযোগে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই বিষয়ে জানালেন - **ডাঃ কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্প্রতি অতীন্দ্র চক্রবর্তীর বানানো একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়াতেই অভাব-অনটনে দিন কাটানো ভদ্রমহিলাটির নাম এখন সবার মুখে মুখে শোনা যায়। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন 'রানু মন্ডল', যাকে অনেকেই রানাঘাট স্টেশনে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে দেখেছেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি তার মেয়েকে নিয়ে রানাঘাটে এসে ওঠেন এবং তখন থেকেই পেট চালানোর দায়ে ট্রেনে ও স্টেশনে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে শুরু করেন, আর সেই কারণেই তার মেয়ে সাথী রায় বিয়ের পর তার মায়ের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখেনি। কিন্তু রাতারাতি রানু মন্ডলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তেই প্রায় দশ বছর পরে সে তার মায়ের কাছে ফিরে আসে। শুধু তাই নয়, মিউজিক ডিরেক্টর হিমেশ রেশমিয়ার তত্ত্বাবধানে রানু মন্ডল হিন্দি সিনেমার জন্য বেশকিছু গানও রেকর্ড করেন। এই ঘটনার পরে অনেকেই বলেছেন, রানু মন্ডলের এই বিপুল পরিমাণ খ্যাতি ও আর্থিক সচ্ছলতার জন্যই তার মেয়ে সাথী আবারও তার মায়ের সাথে যোগাযোগ করে তার কাছে ফিরে এসেছে। তাহলে কি বর্তমান যুগে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার একমাত্র মাধ্যম আর্থিক সচ্ছলতা? মা-মেয়ের সম্পর্ক থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিংবা অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে বা পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে তৈরি হওয়া সম্পর্কগুলিও কি তাহলে টাকা-পয়সার উপরেই নির্ভর করে? তাহলে যাদের টাকা-পয়সা নেই তারা যদি কখনও বিপদে পড়ে তখন কি কেউ তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে না, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না? আজ শুধু রানু মন্ডল বা তার মেয়ে সাথীর কথাই নয়, খবরের কাগজ খুললে প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে সম্পত্তি নিয়ে নানান ধরণের পারিবারিক অশান্তি থেকে শুরু করে আত্মহত্যা ও খুনের খবর।

আজকালকার জীবনযাত্রায় টাকা-পয়সা ছাড়া যেমন এক মুহূর্তও চলা যায় না, ঠিক তেমনই টাকা-পয়সা থাকলেই যে কাছের মানুষগুলিকে কাছে পাওয়া যায় কিংবা সম্পর্কগুলো ভালো থাকে তাও তো হয় না। অনেকেই আছেন যারা বাবা-মায়ের সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে বসে আছে, এমনকি সম্পত্তির ভাগের জন্য রক্তের সম্পর্কগুলোকেও খুন করতে হাত কাঁপে না। আবার অনেক বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বলে সম্পত্তিতে মেয়ের কোনো অধিকার থাকবে না সবই পাবে ছেলে, আর যখন সেই বাবা-মা অসুস্থ হয় তখন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া মেয়েই তাদের সেবা-যত্ন করে কিংবা অনেক সময় পাড়ার প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়ায়।

আমরা নিজেরাই ছোটোদের অহেতুক আবদার মেনে নিয়ে তাদের চাহিদা মিটিয়ে জেদি করে তুলি। আর সেই অভ্যাসের কারণে তারা বড়ো হয়েও যখন সেই অন্যায় জেদ করে, তখনই আমরা তাদের ব্যবহারে হতবাক হয়ে যাই। এমনকি সেই অন্যায় আবদারের বসে তারা যখন বন্ধুবান্ধবের সাথে মারামারি করে তখনও আমরা ছোটো বলে তাদের অন্যায়কে প্রশয় দিয়ে থাকি। আর বড়ো হয়ে যখন ছোটোবেলার সেই সকল মারামারি বড়ো কোনো অপরাধের আকার নেয় সেইসময় আমরা আফশোস করি। তখন মনে হয়, আমাদের আদরের সন্তান হয়তো কোনো খারাপ সংসর্গে পড়েছে। আর সেই সকল খারাপ সঙ্গের দোষেই হয়তো সে এমন বদমেজাজী আর জেদি হয়ে উঠেছে।

আসলে দোষটা কোন খারাপ সঙ্গ বা সম্পত্তির প্রতি লোভের কারণে নয়, আসল সমস্যাটা হলো মানসিকতার। যদি মানসিকতা সঠিক না হয় তবে কোনো শিক্ষাই কাজে আসবে না। ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট কেবলই শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। আপনি মানুষ হিসাবে কেমন তার পরিচয় পাওয়া যায় আপনার ব্যবহারের মাধ্যমেই। আপনি অন্যের বিপদে আর্থিক সহায়তা নাই বা করতে পারেন কিন্তু যদি তার পাশে থেকে মানসিক সান্ত্বনা টুকু দিতে পারেন কিংবা আশার আলো দেখিয়ে ভরসা যোগাতে পারেন তাহলেও তো অনেকটাই করা হয়। টাকা-পয়সা দিলে কাজ করার লোকের অভাব হবে না। আজকাল আয়া সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করে টাকা-পয়সা দিলে সারাদিনের থাকার লোকের ব্যবস্থা হয়ে যায় কিন্তু সে তো কাজ করে চলে যাবে। বাবা-মা অসুস্থ বলে অফিস ছুটি নিয়ে বাবা-মায়ের দেখাশোনা করতে না পারলেও দিনের শেষে যদি আধঘন্টা হলেও বাবা-মাকে সময় দেন তারাও মানসিক ভাবে সুস্থ বোধ করবেন। যে কোনো অসুস্থতাতেই মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, সামান্য মাথা ব্যথাতেও আপনি কেমন যেন খিটখিট করছেন। সেই সময় বাড়ির লোকজন যদি চিৎকার চেঁচামেচি করে তাহলে আপনি আরও অসুস্থ বোধ করেন। এর চেয়ে যদি সেই সময় কেউ আপনাকে একটু কড়া করে চা বানিয়ে দেয় কিংবা ব্যথা কমানো বাম লাগিয়ে দেয়, তাহলেই ব্যথা না কমা সত্ত্বেও আপনি অনেকটা সুস্থ বোধ করবেন। এই কথা শুনে অনেকে একটু অবাক হচ্ছেন, আবার অনেকেই বেশ ভালো বোধ করছেন।

আমরা সব কিছুই মন থেকে ভাবি ও করি, ফলে আমাদের জীবনযাত্রার সামান্য কিছু পরিবর্তনও আমাদেরকে মানসিক অশান্তিতে ফেলে দেয়। আর এর থেকেই জন্ম নেয় মানসিক অবসাদ ও একাকীত্ব। তাই বলে এমন নয় যে, কাজ কর্ম করবেন না সারাক্ষণ বাড়িতে বসে বাড়ির লোকজনের সাথে গল্প করে কাটিয়ে দেবেন। আর তাই যদি করেন তাহলে পেট চলবে কী করে। কাজও করতে হবে, পরিবারকে সময়ও দিতে হবে এবং বছরে অন্তত একবার হলেও বেড়াতে যেতে হবে। মনে রাখবেন, জীবন তো একটাই আর সেটাকে মন-প্রাণ খুলে উপভোগ করুন। টাকা-পয়সা তো আসবে আর যাবে কিন্তু কাছের মানুষগুলো যদি চলে যায় তাহলে হাজার চেষ্টা করলেও তারা আর ফিরে আসবে না। তাই টাকা-পয়সা-দামী জিনিসপত্র এই সকলের প্রতি মায়া ত্যাগ করে সম্পর্কগুলোকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে শুরু করুন, তাতে আপনি ও আপনার কাছের লোকজনেরা সকলেই ভালো থাকবেন। অশান্তি, মানসিক অবসাদ, একাকীত্ব-এগুলি কোনোটাই আপনার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। সকলকে সাথে নিয়ে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং পুজোর আনন্দে মেতে উঠুন। শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও অভিনন্দন।

অ্যাঞ্জেল

একাদশতম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৩ই আশ্বিন ১৪২৬, কলকাতা

গত ২০ বছরে বিশ্বকে এক-তৃতীয়াংশ সবুজায়ন করেছে ভারত ও চিন

চারপাশ থেকে যখন একের পর এক আসছে ধ্বংসের খবর, অবলুপ্তির খবর, তখন সৃষ্টির খবর দিল নাসা।

জানালো, আগের চেয়ে গত ২০ বছরে আরও সবুজ হয়েছে পৃথিবী। এও জানালো, ধ্বংসের মধ্যে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে রয়েছে ভারত ও চিন।

উষ্ণায়নের জেরে যখন তিন-চার ফসলি জমিও উত্তরোত্তর হয়ে পড়ছে অনুর্বর, চাষের অযোগ্য, মাঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মরশুম, তখন নাসা জানালো, বিশ্বের সবুজায়নে পথ দেখিয়েছে ভারত ও চিন। নাসার ওই সাম্প্রতিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানীর, বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'রঙ্গ রামা মায়নেনি'। গবেষণাপত্রটি বেরিয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার সাসটেইনেবিলিটি'র হালের সংখ্যায়।

সেই সবুজায়নের রূপকার মানুষই!

গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন, উষ্ণায়নের জন্য যখন অভিযোগের আঙুল ওঠার বিরাম নেই মানুষের দিকে, তখন এই গবেষণা জানালো, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দু'টি দেশ ভারত ও চিনের নাগরিকরাই ফের প্রাণ ফিরিয়েছেন প্রকৃতির। পরিবেশকে গাছপালাদের জন্য করে তুলেছে আগের চেয়ে বেশি বাসযোগ্য। গাছপালাদের বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন যে আবহাওয়া, পরিবেশ ও পুষ্টির, দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রতিবেশী দেশই, গত দু'দশকে তা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তাতে এলাকা-পিছু শুধু যে গাছপালার সংখ্যা বা তাদের বসতির ঘনত্ব (পপুলেশন ডেনসিটি) বেড়েছে তাই-ই নয়, বেড়েছে গাছে গাছে পাতার সংখ্যা। পাতারাও আগের চেয়ে হয়েছে অনেক বেশি হৃষ্টপুষ্ট। গত ২০ বছরে আরও সবুজ হয়ে উঠেছে ভারত ও চিন।

নাসা জানাচ্ছে, সেই 'অসম্ভব' সম্ভব হয়েছে চিন জুড়ে ব্যাপক বনসৃজনের দৌলতে। আর ভারত ও চিনের কৃষিকাজের কর্মযজ্ঞে।

২০ বছরে কতটা সবুজতর হয়েছে পৃথিবী?

অন্যতম মূল গবেষক, বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানিয়েছেন, প্রায় ২৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বিশ্বের বৃহত্তম বনাঞ্চল, অ্যামাজন বৃষ্টি-অরণ্যও (অ্যামাজন রেইনফরেস্ট) রয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। ২০০০ সালের গোড়ার দিক ধরলে, সেই বৃদ্ধির হার খুব কম হলেও, হবে ৫ শতাংশ।

বিশ্বকে এক-তৃতীয়াংশ সবুজায়ন করেছে ভারত ও চিন!

মায়নেনি বলেছেন, ''গত দু'দশকে যেভাবে কেল্লাফতে করেছে ভারত ও চিন, তা আমাদের রীতিমতো অবাক করেছে। কারণ, পৃথিবীর স্থলভাগের যে পরিমাণ জমিতে চাষবাস হয়, তার মাত্র ৯ শতাংশ চাষের জমি রয়েছে ভারত ও চিনে। এতো কম চাষ যোগ্য জমি হাতে থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বে গত ২০ বছরে যতটা সবুজায়ন হয়েছে, তাঁর এক-তৃতীয়াংশই হয়েছে ভারত ও চিনে। ভূপৃষ্টের দেড় হাজার ফুট গভীরেও ঢুঁ মেরেছে 'মোডিস'

পরিবেশের এই পরিবর্তন বিজ্ঞানী মায়নেনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর হাতে কোনো প্রমাণ না থাকায় তিনি তা প্রকাশ করতে পারেননি। সেটা সম্ভব হয়েছে নাসার পাঠানো দু'টি উপগ্রহে রাখা বিশেষ একটি যন্ত্র 'মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার' বা 'মোডিস'-এর দৌলতে। এই বিশেষ যন্ত্রটি মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ট থেকে শুরু করে তার নীচে প্রায় ১ হাজার ৬০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত রেডিও রশ্মি পাঠিয়ে এই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছে।

তবে এই বিপুল পরিমাণ সবুজায়নের পরেও নিশ্চিন্তভাবে থাকতে পারছেন না গবেষকরা। তাদের মতে, এই সবুজায়ন কোনো ভাবেই উষ্ণায়নের যাবতীয় উদ্বেগকে সরিয়ে দিতে পারেনি। কারণ, গাছপালার বৃদ্ধি, শষ্যের ফলন, উৎপাদন, দীর্ঘ সময়ে ধরে তার সুস্থ, সবল থাকার প্রক্রিয়াটা নির্ভর করে ভূগর্ভস্থ জল, জমির উর্বরতা, তাপমাত্রাসহ আনুষাঙ্গিক বেশ কয়েকটি জরুরি বিষয়ের উপর।

তাহাদের কথা

কায়োটি যা নেকড়ের জাতিবিশেষ হিসেবেই পরিচিত। উত্তর আমেরিকার ব্রাস উল্ফ বা নেকড়েরা কায়োটি প্রজাতির অন্তর্গত। ব্রাস ও ধূসর নেকড়ের জিনের গুণবিশিষ্ট নেকড়ে রেড উল্ফ বা লাল নেকড়ে। ১৯১৭ সালের দিকে এদের বিস্তৃতি ছিল ইউনাইডেট স্টেটসের সমগ্র দক্ষিণ- পূর্ব সহ মধ্য-দক্ষিণ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর, মধ্য টেক্সাস থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ওকলাহোমা এবং দক্ষিণ ওহিও রিভার ভ্যালি, পেনিসিলভেনিয়া, নিউইয়র্ক সহ গল্ফ অব মেক্সিকোতে এদের বসবাস ছিল। একটি প্রাপ্তবয়স্ক লাল নেকড়ে লম্বায় প্রায় ১৩৬ থেকে ১৬০ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ২৩ থেকে ৩৯ কেজির মতো হত। গায়ের লোম লাল এবং ধূসর রঙের সংমিশ্রিত ছিল। মাংসাশী হওয়ার দরুন সাদা লেজের হরিণ, রেকুন, খরগোশ এইসবই ছিল তাদের খাদ্য।

লাল নেকড়কে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। তা হল এইরকম – লাল নেকড়ে আন্তঃপ্রজনন করতে না চাওয়ার দরুন তারা জীবনের বেশ অনেকটা সময়ই একা বা অন্য প্রজাতির সাথে মিলনের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিত। তারা এতটাই বুদ্ধিমান ছিল যে, তারা আন্তঃপ্রজননের ঝুঁকি এবং সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিল। এমনকি এই ধরণের প্রজননের ফলে শরীর ভেঙে পড়া বা অসুস্থ সন্তান প্রসব করার মতোও স্পষ্ট ধারণাও ছিল তাদের মধ্যে।

তবে প্রশ্ন একটা জায়গায়, সুবিশাল এলাকা জুড়ে বসবাস ছিল যাদের, এমন কি যারা এত বুদ্ধিমান, সেই প্রাণীগুলির হঠাৎ করে এমন কি হল যার ফলে তারা বিলুপ্তির পথে এইভাবে এগিয়ে গেল?

লাল নেকড়ের বিলুপ্তির কারণ খুঁজতে গেলে দেখা মেলে বিভিন্ন গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তি এবং তর্ক। বলা যেতে পারে মূলত তিনটি কারণ কাজ করেছিল এই প্রাণীগুলিকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিতে।

শিকার- লাল নেকড়ের পশম জামা কাপড় তৈরীতে বিশাল পরিমাণে ব্যবহার হয়।

চাষবাস- চাষিরা চাষের জমি সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সার ব্যবহার করতে লাগল ফলে হরিণ, খরগোশের মতো প্রাণীগুলির খাদ্যের অভাব ঘটতে আরম্ভ করল, তারাও নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করতে শুরু করল, এই ভাবে লাল নেকড়েরা খাদ্যের অভাবে মারা পড়তে শুরু করল।

উন্নয়ন- প্রথম বিশ্বের এই দেশগুলিতে উন্নয়নের মাত্রা এতটাই বেশি যে, উন্নয়নের ফলে প্রাণীদের ওপর কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে তা ঠিকভাবে বিচারই করে না। আর এই নির্বিচারের ফলেই বিলুপ্তির সম্মুখীন লাল নেকড়ে।

এইগুলি মূল সমস্যা হলেও চোখে পড়েছে অনেক দেরিতে। আর, তার জন্যই এই প্রাণীগুলিকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল অনেক দেরীতে। তবে সংরক্ষণের দরুন তাদের সংখ্যা এখন ৮০ থেকে ১০০-র কাছাকাছি।

ছায়াছবির অন্তরালে

সমস্ত অভিভাবকই চায় বড় হয়ে ছেলে-মেয়ে সফল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। তাই তারা পড়াশোনার প্রতি অতিরিক্ত নজর দেওয়ার সাথে টিউশন, খেলাধূলা এমনকি তাদের ভালো বন্ধুকেও নির্বাচন করে দিতে চান। আর এখান থেকে শুরু হয় সমস্যা। সন্তান আর অভিভাবকের সম্পর্কের মাঝে চলে আসে কড়া শাসন ও নিয়মের গন্ডি। সন্তান বাবা-মা'র অবাধ্য হতে শুরু করে আর সারাদিন একটু স্বাধীনতার খোঁজে হাতড়ে মরে। আর প্রতিটি বাড়িতে প্রায়ই ঘটতে থাকা এই ঘটনা গুলিকে মৈনাক ভৌমিক তুলে ধরেছেন নিজের ছায়াছবি 'জেনারেশন আমি'তে।

বিভূতিভুষণ বন্দোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালির মূখ্য চরিত্র অপু দূগ্গার উপস্থিতি প্রকটভাবে লক্ষ্যণীয় এই সিনেমায়। ঋতব্রত মুখার্জী আর সৌরসেনী মৈত্র মূখ্য ভুমিকায় অভিনয় করেছে। এছাড়াও অপরাজিতা আঢ্য, শান্তিলাল মূখার্জী, লিলি চক্রবর্তী সহ অনেকেই অভিনয় করেছেন। সৌরসেনী দূগ্গার চরিত্রে অভিনয় করছে। দূগ্গা দিল্লিতে থাকে, কেমিস্ট্রিতে অনার্স, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মনোচিকিৎসককে দেখাতে কলকাতায় কাকুর বাড়ি আসা। কাকুর ছেলে দূগ্গার ভাই অপু। তার চরিত্রে অভিনয় করেছে ঋতব্রত মূখার্জী। অপু দশম শ্রেণীর ছাত্র। সে গান গাইতে ও গান লিখতে খুব ভালোবাসে। তার কেমিস্ট্রিতে খুব ভয়। তাই তার বাবা মায়েরও খুব চিন্তা, যদি ছেলে সায়েন্স না পায়, তাহলে আই.আই.টি-তে যাবে কি করে? ঠিক এই কারণের জন্যই ছেলের গানের প্রতি ভালোবাসা বাবা-মা একদমই পছন্দ করে না।

দূগ্গা চিকিৎসার জন্য কলকাতাতে কাকুর বাড়ি আসতেই খুব ভালো মতো উপলব্ধি করেছে যে, সে এক জেলখানায় পা রেখেছে। আগে দূগ্গা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, এমন পরিস্থিতিতে এই পরিবেশ কখনও তার না পাওয়াগুলোকে মনে করায়, আবার কখনও ভাইকে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে শান্তি পায়। কিন্তু দূগ্গার অতীত কলকাতাতেও তার পিছু ছাড়ে না। দূগ্গার বাবা-মা আলাদা থাকে, তারা এই কথাটা অপুর বাবা-মাকেও জানতে দেয়নি। দূগ্গাকে তার বাবা-মা এক মিনিট সময় দেয় কার সাথে থাকবে সেটা ঠিক করার জন্য। এমন অবস্থায় একটি দশম শ্রেণীর পড়ুয়ার মানসিক অবস্থা খুব স্পষ্টই তুলে ধরা হয়েছে 'জেনারেশন আমি'তে।

সিনেমাতে একটি দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে, বাড়িতে একজন লোক এসেছে তাকে অপুর মা বলছে, অপুর কেমিস্ট্রি দুর্বল, যদি কোন আংটি বা কিছু দিয়ে এই সমস্যাটা মেটানো যায়, আর কিছু না হোক অপুর ভয়টা কমানো যায়। এই শুনে অপু রাগ করে উঠে গেলে, দূগ্গাও তার সাথে সাথে উঠে যায়। আর অপুকে বোঝায় যে, অপুর জীবনে আর যাইহোক তার বাবা-মা আছে, তাকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য, সবার ততটাও সৌভাগ্য হয় না, ঠিক দূগ্গার মতো। সিনেমার দু'টি দিক- বাবা-মার সাথে থাকলে কি হয় আর সাথে না থাকলে কি হয়। যেমন- নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির কারণে বাবা-মার ওপর রাগ হলে সন্তানদের যাওয়ার কোনও জায়গা থাকে না আর সেটা যে কতটা সমস্যার তা স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। আবার অভিভাবকদের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সন্তানদের মানসিক অবস্থার কথা সমাজের আগে ভাবা অত্যন্ত জরুরী। তবে এই ব্যাপারে মনোচিকিৎসক সাহায্য করতে পারেন, তবে দায়িত্বটা অভিভাবকেরই।

আনারসের গুণাগুণ

গ্রীষ্মের তীব্র তাপ-প্রবাহের পরে যদি এক পশলা বৃষ্টি হয় তবে সমগ্র প্রাণীজগত দেহে একটু প্রাণ ফিরে পেলেও মাথায় হাত পড়ে দুই ফল চাষীর। এক হলো - জামরুল আর অন্যটি হলো আনারস। এই দুই ফলেরই মিষ্টতা নির্ভর করে গ্রীষ্মের তাপমাত্রার উপর। তাপ যতো বাড়ে এদের মিষ্টত্বও ততোই বাড়ে। হালকা হলদেটে রঙের রসালো এই ফলটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। এই রসালো ফলটি তার জন্মস্থানে পিনকোন নামে খ্যাত হলেও ভারতবাসীর কাছে এই ফল আনারস নামেই খ্যাতি লাভ করেছে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও নানান ধরণের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এই ফলে বিভিন্ন ধরণের এনজাইম রয়েছে যা হজমে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। নানাবিধ খনিজ পদার্থ ও ঔষধি গুণসম্পন্ন মিষ্টি স্বাদের রসালো এই ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম - Ananas comosus। প্রতি ১০০ গ্রাম আনারসে প্রায় ০.৯ গ্রাম প্রোটিন, ২২ গ্রাম কার্বোহাড্রেট, ২০ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৮ গ্রাম আয়রন, ১৮০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ১৬০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ২.৪ গ্রাম ফাইবার, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি সহ নানান যৌগ উপস্থিত। এখন এক নজরে আনারসের নানাবিধ ঔষধি গুণাগুণ সম্বন্ধে জেনে নেবো এই প্রতিবেদন থেকে -

ত্বকের যত্নে আনারসের ভূমিকা

আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকায় এই ফল ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া, ব্রণ, বয়সের ছাপ কিংবা রৌদ্রে বা আগুনের তাপের ফলে পুড়ে যাওয়া জায়গা সারিয়ে তুলতে আনারসের জুড়ি মেলা ভার।

পেটের সমস্যার সমাধান

আনারসে বিটাক্যারোটিন, ভিটামিন-এ, ব্রোমেলিন সহ নানান ধরণের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় হজমের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। তাই রোজকার খাদ্যতালিকায় আনারস রাখলে ফল মিলবে খুব দ্রুতই।

আর্থ্রারাইটিসে আনারসের ভূমিকা

নানাবিধ যৌগ ও খনিজ সমৃদ্ধ এই ফল রোজকার খাদ্যতালিকায় রাখলে মুক্তি পাবেন আর্থ্রারাইটিস থেকেও।

চোখের সুস্থতায় আনারস

আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকায় এই ফল রেটিনাকে সুস্থ রেখে চোখের দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধক আনারস

ক্যানসার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে রসালো এই ফল আনারস। রোজকার জীবনযাত্রায় এই ফলকে রাখলে রক্ষা পাবেন মুখ, গলা ও নানাবিধ ক্যানসারের হাত থেকে।

রক্তের সুস্থতা

প্রত্যহ আনারস সেবনে রক্তে শ্বেত রক্তের পরিমাণ ঠিক থাকে ফলে শরীরও সুস্থ থাকে।

তবে যারা ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শেই এই ফল খাবেন।

মনের রোগ বলে কি আদৌ কিছু হয়?

ডঃ তন্ময় মিত্র, বিশিষ্ট সাইকোলজিস্ট

'কাজের চাপে পাগল হয়ে যাচ্ছি', 'মায়ের বকুনি শুনতে শুনতে কোনদিন মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে', 'নম্বরের জন্য মানসিক চাপ বেড়েই চলেছে'- এই কথাগুলোর সাথে কম বেশি আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত। কিন্তু কথাগুলোর গভীরতাটা কতটা তা কি ভেবে দেখেছি কখনও। তথাকথিত সমাজে মানসিক সমস্যা, ডিপ্রেশন বা মানসিক অস্থিরতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় না। এর কারণ হিসাবে বলা যেতেই পারে সচেতনতার অভাব।

ভারতের মতো দেশে পাগল শব্দটি খুব প্রচলিত এবং পরিচিত। যদিও আমরা অনেকেই জানি না, পাগল বলা কখনই উচিত নয়, মানসিক রোগী বলে সম্বোধন করাটাই শ্রেয়। কিন্তু তা হয়ই না বরং মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই করা বদমায়েশি বলে দেওয়া হয়।

তাহলে মানসিক সমস্যা বলে কি কিছুই নেই?

মানসিক সমস্যা নেই এটা বলা ভুল। তবে মানসিক সমস্যা আছে কিনা এই নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। কারণ, মানসিক সমস্যা মানেই মনের রোগ। এই 'মন' লেখকের কবিতায় শরীরের আর বাকি অঙ্গের মতোই সাধারণ। তো কেউ দাবী করে 'মন' আদপেই একজন মানুষের চিন্তাশক্তি।

আমাদের মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করার জন্য শরীরের ভেতর কিছু রাসায়নিক পদার্থের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরী। মন শরীরের আর পাঁচটি অঙ্গের মতো না হলেও তার উপস্থিতি একটি মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে জানান দেয়। রাসায়নিকের ভারসাম্য নষ্ট হলে একটি মানুষের বাহ্যিক আচরণের ওপর তার প্রভাব পড়ে। যা একইভাবে মনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

এখন প্রায়ই বলিউড সেলিব্রিটিরা নিজেদের মানসিক সমস্যাগুলো নিয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য রাখছেন। তার মানে কি ধরে নেওয়া যেতেই পারে, মন খারাপ বা মানসিক সমস্যা বড় বড় সেলিব্রিটিদের জন্যই?

এই প্রশ্নটার উত্তর যতটা সহজ ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে পড়ে মানসিক রোগের অন্তঃর্নিহিত মানে বোঝানো। কারণ, যেসব সেলিব্রিটি আজ মানসিক রোগ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছে তারাও চাইছে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে। আমরা কথা বলছি না মানে এই নয় যে, মানসিক রোগ বলে আদপেই কিছু হয় না। আমরা বুঝি না, কারণ আমাদের মনে হয় কোনও ঘটনার পরে মনের ভেতর তোলপাড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনার অস্বাভাবিক কুফল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই। যেমন- একটি পড়ুয়া ক্লাস নাইনে অনেক ভালো পরীক্ষা দেওয়ার পরেও অসফল হল। বাবা-মা, পাড়া- প্রতিবেশী আগে তার ভুল খুঁজবে, বকা দেবে। কিন্তু একবারও জানতে চেষ্টা করবে না যে, এত বড় ঘটনায় তার প্রতিক্রিয়া কি? তার কি অবস্থা, কতটা হতাশা বা অবসাদ তাকে ঘিরে ফেলতে পারে তার বিন্দু মাত্র ধারণা নেই এই অভিভাবকদের। এর একটাই কারণ সচেতনতা। সেলিব্রেটিদের সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজার হাজার ফলোয়ারস। তারা যখন মানসিক সমস্যা নিয়ে কথা বলবে, আর যাই হোক কিছু মানুষের মধ্যে মানসিক সমস্যা সম্পর্কে কোনও ধারণা হবে। একজন মনোচিকিৎসক হিসাবে আমি মনে করি, একজন সেলিব্রিটির এইভাবে এগিয়ে আসায় আমাদের চিকিৎসা করতে অনেক সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো, আমাদের দেশে যেমন মনে করা হয় মানসিক সমস্যা বড় লোকেদের অসুখ ঠিক তেমন ভাবেই মনে করা হয় মানসিক সমস্যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের বেশি হয়। এটা সম্পূর্ণভাবে একটি ভুল তথ্য। তবে হ্যাঁ, বলা যেতেই পারে কিছু মানসিক সমস্যা আছে যা শুধুমাত্রই মেয়েদেরই হয়। আবার এমন কিছু মানসিক সমস্যা আছে তা যেমন শুধু মাত্র ছেলেদেরই হয়। এর মানে এই নয় যে, ছেলেরা তুলনায় কম মানসিক সমস্যায় ভোগে বা মেয়েরা বেশি ভোগে।

ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে যারা 'মানসিক রোগে আক্রান্ত' তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার কেন করতে চায় না?

বলাই বাহুল্য, হাতে ব্যথার অনুভব হলে মুখে বলা যায়, কোথাও কেটে গেলে মলম লাগানো যায়। কিন্তু মনের গভীরে চলতে থাকা অস্থিরতা শুধু মাত্র একজন মনোচিকিৎসককেই বলা যায়। কারণ, সে হয়তো একবারেই বুঝবে বা মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করবে। এছাড়াও মানসিক রোগ নিয়ে কিছু গুজব আছে। গুজব সম্পূর্ণ বলা ভুল, আগে এইসব হতো হয়ত। মানসিক সমস্যা মানেই তাকে পাগলা গারদে ভর্তি করে দেওয়া হবে। আর সেখানেই ইলেকট্রিক শক্ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওষুধ খাইয়ে সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে। এই ধরণের গুজব আজও প্রচলিত থাকার দরুণ মানসিক সমস্যা নিয়ে যারা অবগত তারা সবার সামনে বলতে ভয় পায়। এই ভুল ধারণাগুলো থেকে যত শীঘ্রই সম্ভব শিক্ষিত সমাজের বেরোনো উচিত। কারণ 'গারদ' শব্দটা আদপেই সমাজ বিরোধী। আর রোগীর অবস্থা বুঝেই তাকে ওষুধ দেওয়া হয়। ওষুধের ডোজ কড়া হওয়ার দরুন ঘুম পেলেও সেগুলো কোনো ভাবেই ঘুম পাড়ানি ওষুধ নয়। আর মানসিক রোগের ক্ষেত্রে প্রথম যে সমস্যা লক্ষ্য করা যায়, সেখানে রোগীর ঘুম চূড়ান্ত ভাবে কমে যায়, ফলে নার্ভ বা মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায় না। তাই এই ওষুধের ফলে তারা যখন ঘুমায় নার্ভগুলো একটু স্থির অনুভব করে।

সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে মানসিক রোগের কি কোন সম্পর্ক আছে?

প্রত্যক্ষ ভাবে না থাকলেও পরোক্ষভাবে তো আছেই। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়ার দরুন আমরা দূরত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে আপাত দৃষ্টিতে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে যেমন পুরানো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করা যায়, ঠিক তেমনভাবেই চূড়ান্ত একাকীত্বও অনুভব করা যায়। খুব সাধারণ ভাবে ভেবে দেখলে, পুজোর সময় সবাই একটু আনন্দ করতে চায়, এমন সময় গলায় ইনফেকশন হওয়ার দরুন একটি মেয়ে ফুচকা তো খাওয়া দূরের কথা ঘর থেকেই বেরোতে পারল না। এদিকে তার বন্ধুরা সারাদিন বিভিন্ন ছবি পোস্ট করছে। ঘরে বাবা-মা থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে বন্ধুদের ছবি দেখে মন খারাপ করবে। আবার একটি ছেলে সারাটা বছর অনেক কাজ করল, সময় মতো সব কাজও শেষ করল। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক ছেলেটিকে প্রোমোশন করানো হল না। রাতে অবসর সময় যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখবে, তখন সে দেখল, তারই কোনও এক বন্ধু, হয়তো পড়াশোনায় খুব বেশি ভালো ছিল না অথবা ছিল, সে সারা বছর মুখ বুজে কাজ করে প্রোমোশনের অপেক্ষা না করেই বাইরে কোথাও ঘুরতে গেছে বা নিজের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। সেই সময় ওই ছেলেটি একটাই কথা ভাববে 'আমি জীবনে কি করলাম!'। সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে আমরা ছোট ছোট ঘটতে থাকা ভালো ঘটনাগুলোকে উদ্‌যাপন করতেই ভুলে গেছি। সেগুলোকে শুধু মাত্র ফ্রেমে বন্দী বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকেস করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর যার ফল স্বরূপ বাড়ছে একাকীত্ব বাড়ছে মানসিক সমস্যা।

মনের রোগের কি চিকিৎসা করা জরুরী?

আমাদের ভাবনা চিন্তার উর্দ্ধে অনেকক্ষেত্রে মানসিক রোগ কতটা ভয়াবহ। সঠিক সময় চিকিৎসা শুরু না হলে একজন মানুষ চূড়ান্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে গিয়ে আত্মহনন পর্যন্ত করতে পারে। আর ঠিক তার জন্যই আর পাঁচটা রোগের মতো মানসিক সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় বোঝা সে আদৌও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত কিনা। তাই যদি তার নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব তাদের সাহায্য করে, তাহলে একজন মনোচিকিৎসকেরও সুবিধা হয় চিকিৎসা করতে। নিজেকে প্রশ্ন করুন- 'আমি মানসিকভাবে সুস্থ তো?' আপনি কি সামান্য কারণেই রেগে যাচ্ছেন? সর্বদাই বিমর্ষ বা বিষণ্ণ থাকছেন? কোনও খারাপ কিছু ভুলতে পারছেন না? এইগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। মনে রাখবেন, এজন্য শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই সময় থাকতে সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

মানসিক সমস্যায় ভুগছেন মনে হলে মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নিন, তারাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে রোগের সঠিক চিকিৎসা শুরু করবেন।

দূরে কোথাও

অ্যাডভেঞ্চারের জগৎ সুইজারল্যান্ডের স্বীকৃতি পাওয়া গারুচিরা

আলিপুরদুয়ারের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোতো আছেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রায় নতুন পর্যটন কেন্দ্র গারুচিরা। যে পর্যটন কেন্দ্রকে তুলনা করা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে। চারিদিকে সবুজের মাঝে রয়েছে শুধুই বিস্ময়।

আলিপুরদুয়ারের জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলি রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। এই জেলার বক্সা, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, চিলাপাতার মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতো রয়েছেই, তার সঙ্গে কয়েকবছর আগে সংযোজন হয়েছে উত্তরবঙ্গের সুইজারল্যান্ডের স্বীকৃতি পাওয়া গারুচিরাও।

গারুচিরার চারিদিক শুধুই সবুজের সমারোহ। ভূটানের পাহাড়ের বুক চিরে ধেয়ে আসা রোতি নদী বয়ে চলেছে এই সবুজকে ঘিরে। নির্জনতায় ভরা সুন্দর এই প্রাকৃতিক পরিবেশ উত্তরবঙ্গের যে কোন পর্যটন কেন্দ্রকেই টেক্কা দিতে পারে। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার মহকুমার বীরপাড়া মাদারিহাট ব্লকের নতুন এই পর্যটনকেন্দ্রকে সৌন্দর্যের রানী বললেও কোন ভুল হবে না। কয়েকবছর আগে উত্তরবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রের তালিকায় যুক্ত হয়েছে 'গারুচিরা' নামের এই পর্যটনকেন্দ্র।

ভূটান পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত এই মনোরম কেন্দ্রটিতে ইতিমধ্যেই পর্যটকদের জন্য বেশ কয়েকটি সুন্দর কটেজ গড়ে তোলা হয়েছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এইপর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে খরচ করা হয়েছে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা। কটেজগুলির খুব কাছেই রয়েছে গারুচিরা গ্রাম। শাল, সেগুনের ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রামে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারের বাস। গ্রামের পাশ দিয়েই রয়েছে বুনো হাতিদের করিডর। নিত্যদিন দল বেঁধে যাতায়াত করে এই বুনো হাতির দল। তাই এখানে বেড়াতে এলে যে কোনও সময়ে কটেজে বসেই মোলাকাত হয়ে যেতে পারে বুনো হাতির দলের সঙ্গে। এ এক চোখ জুড়ানো মনোরম দৃশ্য। আর তার সাথে নানান পাখিদের কলতান তো রয়েছেই। পাখিদের কলতানে সারাটা দিন গারুচিরা থাকে মুখরিত।

গারুচিরাকে কেন্দ্র করে ঘুরে নেওয়া যেতে পারে বান্দাপানি ও কালাপানি জঙ্গল। মাত্র কয়েক পা এগোলেই রয়েছে ভূটান পাহাড়। নদী, পাহাড় আর জঙ্গলের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র যেন গারুচিরা। বনদপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের অধীনে রয়েছে এই পর্যটন কেন্দ্রটি। পর্যটকদের দেখাশোনা করার জন্য বনসুরক্ষা কমিটি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১১জন মহিলা ও পুরুষ রয়েছেন। বৈদ্যুতিক আলোর পাশাপাশি পর্যটকদের সুবিধার জন্য সোলার সিস্টেমের মাধ্যমেও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে কটেজগুলোতে। আর তাছাড়া কটেজগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা গ্রামবাসীরা পর্যটকদের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখেন না।

সম্প্রতি এই পর্যটন কেন্দ্রের ভেতরেই গড়ে তোলা হয়েছে রঙিন মাছ চাষ প্রকল্পের, যা একটি আর্কষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। কারণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করেই এখানে রঙিন মাছ চাষ করা হচ্ছে। ডুয়ার্সের বানার হাট ও বীরপাড়া হয়ে গারুচিরায় পৌঁছানো যায়। আসার পথে রয়েছে রোতি নদী ও বেশ কয়েকটি পাহাড়ি ঝরনা। তবে নদী পারাপারের জন্য কোনও সেতু নেই এখানে। তাই গাড়ী করেই পার হতে হয় এই সকল নদী। তবে বর্ষার সময় ছাড়া এই নদী সারা বছরই প্রায় শুকনোই থাকে। গারুচিরায় যাওয়া-আসার রাস্তাটা অনেকটা ভুলভুলাইয়ার মতো। তাই গাড়ী নিয়ে একটু সতর্কভাবেই যাতায়াত করতে হবে এখানে।

এই পর্যটন কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা বিধান ছেত্রী ও বিকাশ থাপারা জানিয়েছেন, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে দারুণভাবে মোহিত হন পর্যটকরা। সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছিলেন শ্রীনাথ মুখার্জি, ইন্দিরা মুখার্জি ও কস্তুরি চ্যাটার্জি সহ বেশ কয়েকজন পর্যটক। এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এক কথায় তাঁরা জানিয়ে দেন, সুযোগ পেলেই আবারও গারুচিরাতেই ছুটে আসতে চান।

জলপাইগুড়ির জেলা আধিকারিক কল্যাণ ঘোষ বলেছেন, 'সৌন্দর্যের অপার খনি রয়েছে এই গারুচিরায়। একদিকে রয়েছে ভূটান পাহাড় আর অন্যদিকে রোতি নদী ও ঘন জঙ্গল'।

বুনো হাতিদের একটি বড় আস্তানা এই জঙ্গল। পাহাড়ি নদী ও ঝরনা পেরিয়ে গারুচিরায় আসার মজাই আলাদা। রীতিমত একটা অ্যাডভেঞ্চারের জগৎ এই গারুচিরা অঞ্চল। এই পর্যটন কেন্দ্রকে বিকশিত করার জন্য আগামী দিনে আরও দু'টি কটেজ গড়ে তোলা হচ্ছে এখানে। সেই সঙ্গে এঁরা বলেছেন, 'গারুচিরাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম গড়ে তুলছেন তাঁরা। পর্যটকদের কাছে রীতিমতো রহস্যময় মনে হবে এই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম। পার্শ্ববর্তী বান্দাপানি ও কালাপানি সহ বেশ কয়েকটি এলাকাকে সামিল করা হবে এই ট্যুরিজমে'। যেহেতু এটি একটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত, তাই আগামীদিনে আন্তর্জাতিক পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলাই জেলা বনাধিকারীদের লক্ষ্য বলে জানা যায়। জেলা বনাধিকারীক কল্যাণ ঘোষ আরও বলেছেন, এখান থেকে পর্যটকদের ভূটানের গুম্ফা, চা-বাগান সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। গারুচিরাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলে একটি ট্রেকিং জোন গড়ে তোলা হয়েছে।

আগামীদিনে প্রস্তাবিত আলিপুরদুয়ার জেলায় শামিল হবে গারুচিরা। তবে জলপাইগুড়ি জেলার বনবিভাগের মধ্যেই থাকছে এই পর্যটনকেন্দ্রটি। অপার সৌন্দর্যের অধিকারী এই গারুচিরাকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারের পর্যটন শিল্প আগামীদিনে এক অন্য মাত্রা পাবে। রাজ্য বনদপ্তরও চাইছে এই পর্যটনকেন্দ্রকে সামনে রেখে স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে। এজন্য বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে রাস্তা, কালভার্ট ও নদীবাঁধ গড়ে তোলা হচ্ছে। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজ্য বন উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গারুচিরার উন্নয়নের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এই পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে অর্থ কোন বাধা হায় দাঁড়াবে না। দেখা যাক, রাজ্য বনদপ্তর গারুচিরাকে কতটা গর্বিত করতে পারে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কোচবিহার থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে সেখান থেকে আবার সকাল ৭টা ও ২টোয় NBSTC-এর বাসে যাওয়া যাবে গারুচিরা।

কোথায় থাকবেন

বনদপ্তরের কিছু কটেজ রয়েছে এখানে। কটেজগুলির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁরা পর্যটকদের আপ্যায়নে কোন রকম ত্রুটি রাখেন না।

কিছু জানতে হলে

বনদপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের অধীনে রয়েছে এই পর্যটন কেন্দ্রটি। কিছু জানতে চাইলে এরাই সবকিছু বলে দেবে। তাছাড়া যোগাযোগ করা যেতে পারে - DFO, Cooch Behar-736101, Ph. - (03582) 227185 / 227499, **কলকাতা যোগাযোগ** - WBFDC, Ph. - 22370061 / 22258549। এদের কাছে বুকিংও করতে পারেন।

যাওয়ার ভালো সময়

মার্চ থেকে মে আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস বেড়ানোর ভালো মরশুম।

টুকরো খবর

অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেল ভিনেশ

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সারহা হিল্ড্রেব্যান্ডকে হারিয়ে দিলেন ভারতের ভিনেশ ফোগাট। আর এর সাথে টোকিয়ো অলিম্পিকে ৪৩ কেজি বিভাগে লড়াই করার সুযোগও জিতলেন।

জাপানের চ্যাম্পিয়ন মায়ু মুকাইদার কাছে হেরে সোনা জেতা হয়নি ভিনেশের। তবে ব্রোঞ্জ পাওয়ার লড়াইয়ে নিজের জায়গা পাকা করে নেওয়ার খেলায় প্রথম রিপ্যাচেজ রাউন্ডে ব্ল্যাহিন্যাকে ৫-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিল ভিনেশ। তারপর ব্রোঞ্জের লড়াইতে নিজের জায়গা পাকা করার সাথে সাথে অলিম্পিকের টিকিটও নিশ্চিত করে নিল হরিয়ানার ২৫ বছর বয়সী ভিনেশ ফোগাট।

ঘরে ফিরল নটরাজ

সাঁইত্রিশ বছর আগে চোরা কারবারিদের হাতে বেআইনিভাবে পাচার হয়ে যাওয়া নটরাজের মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেল অস্ট্রেলিয়াতে। সন্ধান পাওয়ার পরেই তড়িঘড়ি ফিরিয়ে আনা হল ভারতে। ২.৫ ফুট লম্বা ও প্রায় ১০০ কেজি ওজনের এই নটরাজের বয়স কম করে সাতশো বছর। অ্যাডিলেডের আর্ট গ্যালারি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে বিগত ১৯ বছর ধরে রাখা হয়েছিল এই নটরাজের মূর্তিটি। তারা আন্তর্জাতিক মূর্তি ও নিদর্শনের বাজার থেকে প্রাচীন এই মূর্তিটি তারা সংগ্রহ করেছিল।

প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার কালিদাইকুরিচি গ্রামের কুলসেকরমুদায়ার অরামবালারথ নয়গী মন্দির থেকেই আরও দু'টি মূর্তির সাথে এই নটরাজের মূর্তিটিও খোয়া গিয়েছিল।

অ্যাডিলেড মিউজিয়ামের কিউরেটর নয়াদিল্লির

এএসআই-এর হাতে মূর্তিটি তুলে দেয় এবং তারপরই দিল্লি থেকে সেটিকে চেন্নাইতে নিয়ে আসা হয়। আর্ন্তজাতিক বাজারে এই অ্যান্টিক মূর্তিটির দাম প্রায় ৩০ কোটি টাকা।

ভীমকুন্ড রহস্য আজও অব্যাহত

মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলার একটি প্রাকৃতিক জলাশয় আছে যা ভীমকুন্ড নামে পরিচিত। এই জলাশয়কে ঘিরে রয়েছে অনেক পৌরাণিক কাহিনী। মহাভারতে এই ভীমকুন্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন পান্ডবরা অজ্ঞাতবাসে ছিল, তখন তারা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় দ্রৌপদীর জল তেষ্টা পায়। কাছাকাছি কোথাও জল না পেয়ে, ভীম নিজের গদার আঘাত মাটিতে করতেই সেখান থেকে জল বেরিয়ে আসতে শুরু করে আর এই ভাবেই ভীমকুন্ডের সৃষ্টি হয়। তবে এই জলের উৎস বা গভীরতা এবারেও মাপা সম্ভব হল না। জলের ২৫০ ফুট নীচে প্রবল স্রোতের সন্ধান পাওয়া গেলেও সেই স্রোতের উৎপত্তি বা কারণ কোনও কিছুই জানা সম্ভব হল না। ওই এলাকার বাসিন্দারা মনে করেন, এই জলাশয় অত্যন্ত পবিত্র এবং যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার আগে এই জলাশয় সেই বিপদের আভাস জানিয়ে দেয়। এমনকি সুনামির আগেও প্রবল জলোচ্ছাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল ভীমকুন্ডে।

পাখিদের মৃত্যুর বিচারের দাবীতে খুদে পড়ুয়ারা

চালকলের মালিক আবুল কাশেম ইচ্ছাকৃত ভাবে বিষাক্ত চাল শুকাতে দিয়েই শতাধিক পাখিকে খুন করেছে। এমনই দাবি করল বাংলাদেশের লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট রোডের বাসিন্দারা।

এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামে পশুপ্রেমীরা। খুদে পড়ুয়ারাও পাখি হত্যার প্রতিবাদে পথে নামে। স্কুল ইউনিফর্মে মৃত পাখিগুলির পাশে পোস্টার হাতে তারা প্রতিবাদ জানাতে থাকে, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই এফ.আই.আর. দায়ের করে পুলিশ।

এর আগে বাংলাদেশে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু হয় তার প্রতিবাদে সমস্ত স্কুল পড়ুয়ারা ইউনিফর্ম পরে পোস্টার হাতে রাস্তায় বেরোয়। শিশুদের এইরকম প্রতিবাদ একবারেই বাংলাদেশের রাস্তায় সারিবদ্ধ যান চলাচলের চিত্র তুলে ধরেছিল। এবার নৃশংসভাবে পাখি হত্যার বিরুদ্ধে পথে নেমেছে তারা। বাংলাদেশের পশুপ্রেমীসহ পড়ুয়ারা সকলেই হাল না ছেড়ে সুবিচার পাওয়ার আশায় দিনগুনছে।

তিনি বিদ্যার নয় অনুপ্রেরণার সাগর

প্রচুর টাকা খরচ করে পড়েছি বলে আমার ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে, প্রয়োজনে দেশের বাইরে চলে যেতে হবে এমন মানসিকতার পরিবর্তনের সময় আসন্ন।

ভালোভাবে পড়াশোনা করে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন কোন শিশুটাই না দেখে? কিন্তু লাভ কি! যদি এত পড়াশোনার পর তা দেশের স্বার্থে বা জনকল্যাণে প্রয়োগই না করা হয়? এই প্রতিবেদনে আই.আই.টি-র প্রাক্তন প্রফেসর ডঃ অলোক সাগরের কথা জানব, যিনি পড়াশোনার জন্য খরচ হওয়া হাজার হাজার টাকা ফিরিয়ে আনতে ভারতের বা তার বাইরের কোনও বড় কোম্পানিতে নিযুক্ত না হয়ে বরং তার প্রাপ্ত শিক্ষাকে কি ভাবে কাজে লাগিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তার ব্যবস্থা করা।

১৯৯০-এর মাঝামাঝি কোনো এক সময়, দিল্লির এক সাধারণ পরিবারে জন্ম হয় অলোক সাগরের। সাধারণ ঘরে বড় হয়ে ওঠা ছেলেটির স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই ভর্তি হয়েছিল আই.আই.টি. দিল্লিতে। চার বছর পরে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ভবিষ্যতে কি করবে সেই ভাবতে গিয়েই তার মনে হল স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা করাই শ্রেয়। সেই মতোই পড়াশোনা এগোল। এরপরই গবেষণা সংক্রান্ত পড়াশোনা করার জন্য হাউস্টন ইউনিভার্সিটিতে পাড়ি দিলেন। পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি নিয়ে যখন দেশে ফিরছিলেন স্পষ্টতই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার বিশেষ কোনও ধারণা ছিল না। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, তার পড়াশোনার জন্য খরচ হয়ে যাওয়া টাকা উপার্জন করতে খুব বেশি সময় তার লাগবে না। কিন্তু তার মনে একটাই প্রশ্ন বারবার করে ঘুরতে শুরু করে। এত পড়াশোনা কি শুধুমাত্রই পেট চালানোর জন্য। এত শিক্ষা যদি জীবন-যাপনের জন্য বাস্তবিক রূপে ব্যবহার নাই হয়, তাহলে এত কিছুর কারণ কি?

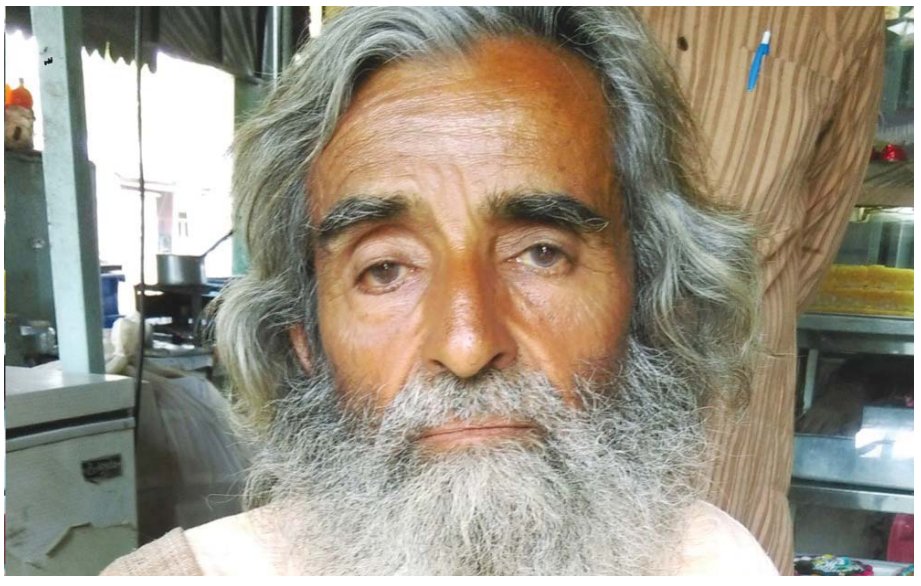

এই প্রশ্নের তাড়ায় তিনি সবার প্রথমে দেশের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, একমাত্র পরবর্তী প্রজন্মই পারে দেশের খারাপ অবস্থা বদলাতে। তাই তিনি পড়াতে শুরু করেন। সেখানে তিনি পড়ুয়াদের দেশের অবস্থা এবং দেশের নাগরিক হিসাবে তার কতর্ব্য সম্পর্কে অবগত করা সহ সঠিক শিক্ষা প্রদান করলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশের অবস্থা বদলাতে মোমবাতি মিছিল করলেই চলবে না, জ্বালাতে হবে আগুন। আর সেই আগুন হবে শিক্ষার। আর হাজার হাজার পড়ুয়ারাই হতে পারে সেই আগুনের ধারাবাহক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন একসময় প্রফেসর অলোক সাগরের ছাত্র ছিলেন।

প্রফেসর কিছুটা সময় পর বুঝলেন, পেট চালানো আর বিল মেটানোর জন্য কতক্ষণ আর কাজ করবেন? আর শুধু ছাত্রদের তৈরী করলেই তো হবে না, তৃণমূল স্তর থেকে কাজ শুরু করতে হবে। তাই শিক্ষকতার গন্ডি পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন ভারতের সেই গ্রামগুলিতে, যেখানে শুধু শিক্ষার বা জ্ঞানের আলোরই অভাব নয়, অভাব আছে সুস্থ জীবনযাত্রার।

সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকা গ্রিন হাউস গ্যাস আর তার জন্যই পৃথিবীর অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকা তাপমাত্রা রোধের একটি মাত্র উপায় গাছ লাগানো। আর ঠিক তার জন্যই মধ্যপ্রদেশের বেতুল এলাকায় সাইকেলে চড়ে সাদা ধুতি পরে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি গাছের চারা বিতরণ করার কর্মসূচী শুরু করেন। একটি সময় একটি মাত্র গাছ লাগানো শুরু করে গ্রামটিকে প্রায় সবুজে ভরিয়ে তোলেন। শুধু তাই নয় ওই রাজ্যের ওপর একটি জেলা যার নাম কোচামু, সেই গ্রামের ৭৫০ জন উপপ্রজাতির বাসিন্দা বসবাস করেন। তাদের শিক্ষার আলো দেখানোর জন্য নিজে ছোটছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা শেখাতে শুরু করেন। গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং সঠিক রাস্তাঘাট চালু করার জন্য সরকারি সমস্ত জায়গায় নিজে আবেদন করা শুরু করেন।

তিনি প্রচারের আলো থেকে অনেক দূরে ছোট্টো সেই গ্রামে নিজের মতো করে এই মানুষগুলিকে সাহায্য করে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সমস্যা শুরু করে সরকারী কর্তৃপক্ষ। অনেকবারই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সরকারী আধিকারিকরা কিছুই করে উঠতে পারে না যখনই জানা যায় তিনি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি ধারী একজন প্রফেসর এবং তার সাথে সরাসরিভাবে আই.আই.টি-র একটি যোগসূত্র আছে। প্রফেসরের বিরুদ্ধে পিটিশন জমা দেওয়া থেকে শুরু করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সব প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছে এবং সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে গিয়ে প্রফেসর তৃণমূল স্তর থেকে দেশের এবং পরিবেশের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি খুব স্পষ্টতই এই প্রজন্ম এবং আগত পরবর্তী প্রজন্মকে উপলব্ধি করিয়েছেন 'ডিগ্রি থাকলে অসৎ চিন্তাভাবনার ব্যক্তিত্বরা কিছুই করতে পারবে না', আর পড়াশোনা করে অর্জন করা জ্ঞান সাহায্য করবে সমস্ত পরিস্থিতির সাথে লড়াই করার'। আর এইভাবেই তিনি শিক্ষিত সমাজসহ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরিত করেছেন এগিয়ে যাওয়ার এবং দেশকে এবং পরিবেশকে অসাধু ব্যক্তিদের থেকে রক্ষা করার।

আত্মরক্ষাই জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পন্থা

সফলভাবে আত্মরক্ষা করতে শিখে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বাবলম্বী হয় না, নিজের সাথে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও সক্ষমও হয়।

২০১৯ সালে দাঁড়িয়ে যখন আমরা লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছি, আত্মনির্ভরতা নিয়ে চিন্তিত, ঠিক তেমন ভাবেই জরুরী আত্মরক্ষার বিষয়ে নজর দেওয়ার। কারণ, সমাজের সমস্ত মানুষ এবং তাদের চিন্তা ভাবনার দৌড়ও সমান নয় আর ঠিক তার জন্যই প্রয়োজন আত্মরক্ষার।

জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার সময় এমন কিছু কাজের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করি যা করে আনন্দ পাওয়া যায় এবং জীবন-যাপনেও সুবিধা হয়। আর সেই তাগিদেই আজকের বিষয় 'ক্রভ মগা'। শব্দটি পুরোপুরি ইংরেজি বলা ভুল কারণ এটি ইজরাইলের ভাষা। এটি আসলে আত্ম ত্মরক্ষার একটি ধাপ। ইজরাইলের যেসমস্ত সেনাবাহিনী আছে তাদের এই 'ক্রভ মগা' অস্ত্র ছাড়া শত্রুকে জখম করে নিজের আত্মরক্ষার পদ্ধতি শেখানো হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ইজরাইল সেনার আত্মরক্ষার এই পদ্ধতি শেখা উচিত নারী সহ সমস্ত মানব জাতির। কারণ এর ফলে হঠাৎ সম্মুখীন বিপদ, যেমন- চোর, ছিনতাইবাজ, এমনকি ধর্ষকদেরকেও নিমেষে ঘায়েল করে আত্মরক্ষা করা সম্ভব।

ইজরাইল থেকে পাড়ি দিয়ে ক্রভ মগা পদ্ধতি ছড়িয়ে গেছে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিতে। তবে মার্শাল আর্ট ভারতে কিছুটা পরিচিত ও জনপ্রিয় হলেও যারা এইসব ব্যাপারে তেমন চর্চা করে না তারা ক্রভ মগা সম্পর্কে বিশেষ জানেন না। তাই ক্রভ মগা শিখে বাড়িতে যদি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের, কলেজ পড়ুয়া বা গৃহবধূদেরও এই ট্রেনিং দিতে পারেন তাহলে বেশ ভালো হবে। কারণ, বিপদ শুধু বাইরে নয়, অসতর্কে ঘরেও অপেক্ষা করে আর ঠিক তার জন্যই গৃহবধূরাও এই ট্রেনিং নিতে পারে।

ট্রেনার হতে গেলে কিছু জিনিষ মনে রাখার প্রয়োজন, যেমন-

দক্ষতা

মার্শাল আর্টস আর ক্রভ মগার কিছু পার্থক্য আছে। আগে সেই বিষয়ে নিজেকে অবগত হতে হবে। তারপর অন্যকে শেখানোর দায়িত্ব নিতে হবে।

ফিটনেস

ট্রেনারকে নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যচর্চার দিকে নজর দিতে হবে।

দক্ষতা

ট্রেনিং দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ট্রেনিং নিতে আসা সবাই হাতের মারপ্যাঁচ ধরতে পারে, না হলে তারা কখনই শিখবে না।

স্বাগতপূর্ণ

ক্রভ মগার ট্রেনিং নিতে আসছে তাই তারা দূর্বল, এমন ভাবা চূড়ান্ত ভুল। আর ঠিক তার জন্যই কাউকে কমজোরি না ভেবে স্বাগতপূর্ণভাবে আহ্বান জানান এবং আত্মরক্ষার পন্থাগুলি শিখতে সাহায্য করুন।

ক্রভ মগার ট্রেনার হতে গেলে অথবা মার্শাল আর্টের সাথে তার বিভাজন করতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। ভারতে সুবিশাল ভাবে ক্রভ মগা নামটি প্রচলিত না হলেও যারা জানে তারা আত্মরক্ষার সাথে এই পন্থাটিকে জীবিকা হিসাবেও গ্রহণ করেছে। তাই প্রথমে ক্রভ মগা ভালো করে শিখে নিয়ে তারপর এটিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করাই যায়। আবার অন্যভাবে ক্রভ মগা বিশেষজ্ঞ ট্রেনারদের নিয়ে নিজেই একটি ইনস্টিটিউট চালু করা যায়। যা অনলাইনে বা অফলাইনে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আত্মরক্ষার বিষয়ে সচেতন করা এবং আত্মরক্ষার এই পন্থা শেখার আহ্বানও করা যায়। পরিষ্কার ভাষায় ব্যবসায়িক বিষয়গুলিকে এর সাথে মিলিয়ে নতুন ধরণের জীবিকা সৃষ্টি করা সম্ভব।

বিশেষত, এই ধরণের ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে মহিলা ট্রেনারদের চাহিদা অনেক বেশি। কারণ ট্রেনারের গুণাবলী অনেক তাড়াতাড়ি রপ্ত করে মহিলারাই। আর যেখানে মেয়েদেরই এইটা শেখা বেশি প্রয়োজন সেখানে স্বাভাবিকভাবেই মহিলা ট্রেনারদের চাহিদাও বেশি হবে।

এবার জেনে নেওয়া যাক ভারতের কোথায় কোথায় শেখানো হয় ক্রভ মগা-

KRAV MAGA Gym! Salt Lake
Address: IA-289, IA Block, Sector III, Bidhannagar, Kolkata, West Bengal - 700097.

Solace Day Spa and Wellness Centre
Address: 4, Sunny Park, Ballygunge, Kolkata, West Bengal -700019.

Alpha Omega Combat Sports
Address: 34, Circus Ave., Lower Range, Elgin, Kolkata, West Bengal -700017

Association Of Sports And Mixed Martial Arts Bengal
Address: GA/29, Narayantala, Kolkata, West Bengal - 700101.

Indian Institute of Martial Arts IIMA
Address: 45, SK Deb Rd, Block Number 5, Shree Bhumi, Lake Town, Kolkata, West Bengal-700048

শিশুর মোবাইল প্রীতি, আপনার শাসন ও কর্তব্য

তুতুল একবার হাতে স্মার্টফোনটা পেলে আর ছাড়তেই চায় না। চোখ রাঙানি, মুখ ঝামটানি দেওয়ার পর বই নিয়ে বসে। মাত্র ৪ বছরেই চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা। তুতুলের বয়সি বা তার চেয়ে ছোট অথবা বড় শিশুরা এখন মোবাইল হাতে পেলে বাকি সব কিছুকেই তারা ভুলে যায়। এক নাগাড়ে ইউটিউবে নানা রকমের ভিডিও দেখা আর তা না হলে গেম খেলতেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরজন্য বাবা-মায়ের বা বাড়ির বড়োদের থেকে বকা খেলেও তাদের ফোন ঘাঁটার স্বভাব ছাড়ানো যাচ্ছে না। এরজন্য কি দায়ী শুধু শিশুরা? না, একতরফা সন্তানের ওপর দোষ দিলে চলবে না। এরজন্য দায়ী কিন্তু অভিভাবকরাও। বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য বেশির ভাগ সময় বাবা-মা বা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা মোবাইলে গেম বা ইউটিউবে ভিডিও চালিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দেন। আবার আপনি টিভি দেখতে বসলেন যদি আপনার টিভি দেখায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই ভেবে ওই সময়ও আপনি বাচ্চাটির হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দেন। শুরুটা হয়তো ঠিক এখান থেকেই।

বাচ্চাকে সামলাতে পারচ্ছেন না বলে মোবাইল ধরিয়ে দেয়ার অভ্যাসটা ঠিক নয়। বাচ্চার হাতে স্মার্ট ফোন ধরিয়ে দেওয়াটা ভুল কাজ নয়, কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে। ওকে মোবাইল দেওয়ার আগে এই শর্তগুলো শিখিয়ে দিন, যাতে অনেকক্ষণ মোবাইল ঘাঁটার ফলে ওর চোখেরও কোনও ক্ষতি হবে না আর অভ্যাসগুলোও বদলাতে পারবেন।

চোখের এক্সারসাইজ- অতিরিক্ত মোবাইল ঘাঁটার ফলে বাচ্চাদের চোখে চাপ সৃষ্টি হয়। যার জন্য দৃষ্টিতে সমস্যা তৈরি হয়। তাই এখনই সচেতন হতে হবে। শুরুটা করুন ফোকাসিং এক্সারসাইজ দিয়ে।

ফোকাসিং এক্সারসাইজ- ফোকাসিং এক্সারসাইজ হল, কোনও বস্তুকে কাছ থেকে, মাঝামাঝি দূরত্ব থেকে দেখা। অর্থাৎ কাছ থেকে কোনও জিনিসকে কিছু সময় দেখার পর একটু দূরের কোনও জিনিসকে দেখা, তারপর অনেকটা দূরের কোনও জিনিসের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকানো। এভাবে সারাদিনে চার থেকে পাঁচবার অভ্যাস করাটাকেই ফোকাসিং এক্সারসাইজ বলা হয়। মোবাইল ঘাঁটার ১০ মিনিট অন্তর বাচ্চাকে এই এক্সারসাইজ করান। প্রথম-প্রথম ও হয়তো দুষ্টুমি করবে বা বিরক্ত দেখাবে। কিন্তু মোবাইল হাতে

দেবার আগেই মনে করিয়ে দিন যে, সে যদি আধ ঘন্টা মোবাইল ঘাঁটে তবে তাকে এই এক্সারসাইজটা দশ মিনিট অন্তর করতেই হবে।

রোটেশান এক্সারসাইজ- চোখের মণিটাকে গোল গোল করে ঘোরাতে শেখান বাচ্চাকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘড়ির কাঁটার মতো করে চোখের মণিটাকে ঘোরালে চোখের এক্সারসাইজ হয়। এতে চোখে পাওয়ারের সমস্যা তৈরি হয় না, চোখের দৃষ্টি সঠিক থাকে। দিনে চার থেকে পাঁচবার এভাবে চোখের মণিটাকে ঘোরাতে শেখালে চোখের এক্সারসাইজ হয়। তাই বাচ্চারা এই এক্সারসাইজকে খুব সহজেই শিখে নিতে পারবে।

ব্লিঙ্কিং এক্সারসাইজ- মোবাইলে বা ল্যাপটপে এক নাগাড়ে গেম বা ভিডিও দেখার ফলে বাচ্চার চোখে ড্রাই আইয়ের সমস্যা তৈরি হতে পারে। যার ফলে ধীরে ধীরে চোখ চুলকানো বা চোখে জল কম আসার মতো সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা তৈরি হয় দীর্ঘক্ষণ এয়ারকন্ডিশনের মধ্যে থাকা বা অনেক সময় ধরে চোখকে বিশ্রাম না দেওয়ার কারণে। বাচ্চা যখনই এক নাগাড়ে মোবাইল ঘাঁটবে, টিভি কিংবা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে তখনই কয়েক মিনিট অন্তর ওকে চোখের পলক বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিতে বলুন।

সূর্যদর্শন এক্সারসাইজ- সকাল-সকাল বাচ্চাকে বাইরে নিয়ে বেরোনোর অভ্যাস করুন। হাল্কা সূর্যের আলোর দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে ওকে চোখের পলক কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ করতে বলুন। এই সময় ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে বলুন। এই এক্সারসাইজ কয়েক মিনিটের জন্য প্রতিদিন করতে শেখান।

ভাবনার ঘড়ি- বাচ্চার সঙ্গে যখন অবসর সময় কাটাবেন তখন ওকে বলুন চোখ বন্ধ করে একটা বড় দেওয়াল ঘড়ির কথা কল্পনা করতে। তারপর, ঘড়ির প্রতিটা নম্বরগুলোকে কল্পনা করতে। এবার ওকে প্রশ্ন করুন ঘড়িতে কত সময় হয়েছে। আবার ওকে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ঘড়ির ফ্রন্টাল অংশে ফিরিয়ে আনুন। দিনে দু'বার দশ মিনিট করে বাচ্চাকে চোখের এই এক্সারসাইজ করানোর অভ্যাস করুন।

মোমবাতির আলোয় এক্সারসাইজ- পড়ার টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বেলে বাচ্চাকে কিছু সময়ের জন্য বই পড়তে বলুন। এই সময় ওকে বলুন প্রতি পাঁচ সেকেন্ড অন্তর চোখের পলকটা খোলা-বন্ধ করতে।

দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে

- ❒ সকাল থেকে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত অন্তত দু'বার স্বচ্ছ জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নিন।
- ❒ চোখের পলক প্রতি পাঁচ সেকেন্ড অন্তর ফেলা উচিত। এতে ড্রাই আইয়ের সমস্যা হয় না।
- ❒ যখন কোথাও ভ্রমণ করবেন, তখন চেষ্টা করবেন বই পড়ার, বাচ্চারা যেন মোবাইল বা ল্যাপটপ না ঘাঁটে।
- ❒ অন্ধকারে কিছু দেখার চেষ্টা করা চোখের জন্য ক্ষতিকর।
- ❒ খুব উজ্জ্বল আলো বা খুব কম আলোয় বই পড়া চোখের জন্য ক্ষতিকারক। পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোয় বাচ্চাকে পড়াশোনা করাবেন।

কোজাগরী লক্ষীপুজো

''এসো মা লক্ষ্মী, বসো ঘরে..'' - লক্ষ্মী পুজো মানেই ধান-শস্য-ফসল-ধনসম্পদের দেবী মা লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। দূর্গা পুজোর ঠিক চারদিন পরেই হয় লক্ষ্মী পুজো। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো সম্বন্ধে অজানা কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

''কোজাগরী'' শব্দের অর্থ কো জাগতী অর্থাৎ কে জেগে আছো। বলা হয় যে, মানুষ প্রধানত দু'টি কারণে ঘুমতে পারে না, এক - ধনসম্পদ না থাকলে অভাব অনটনে রাতের ঘুম উড়ে যায় আর দুই হলো যাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে তারা সেই সব ধনসম্পদ হারানোর ভয়ে রাতে ঘুমতে পারেন না। কথিত আছে, কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে দেবীলক্ষ্মী মর্তে দেখতে আসেন যে কে জেগে থেকে অক্ষ ক্রীড়া অর্থাৎ পাশা খেলছে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা আছে,

''নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ
জাগরত্তীতিভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ
ক্রীড়ং করোতি যঃ।।''

অর্থাৎ যারা কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে রাতে জেগে থেকে অক্ষ ক্রীড়া করে, দেবী তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ধনসম্পদে ভরিয়ে দেন। কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মী পুজোর দিন দেবী লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে সারা বাড়ি জুড়ে আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে আর সেই আলপনার বিশেষত্ব হলো আলপনায় অঙ্কিত দেবীর পা, মুদ্রা ও ধানের ছড়া। দেবী নানান রূপে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে পূজিত হয়ে থাকেন। সেই সকল রূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মূর্তি পুজো - বেশির ভাগ মানুষই মাটির তৈরি মূর্তি পুজো করে থাকেন আবার অনেকের বাড়িতে পিতলের মূর্তিতে বংশ-পরমপরায় পুজো করা হয়ে থাকে। তাছাড়া রয়েছে আরি লক্ষ্মী - এইক্ষেত্রে বেতের তৈরি চুপড়ি বা ঝুড়িকে ধান দিয়ে ভর্তি করে তার উপর গাছকৌটো রেখে চেলি কাপড় দিয়ে মুড়ে মূর্তির আকার দেওয়া হয়। আবার অনেকে সরার পটচিত্রকেও পুজো করে থাকে। অনেক বাড়িতে আবার কলা গাছের বাকল দিয়ে নৌকা তৈরি করে তাতে ধান, মুদ্রা, কড়ি ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করা হয়, এই নৌকাকে বলা হয় সপ্ততরী, যা বাণিজ্যিক তরী হিসাবে সাজানো হয় আর প্রার্থনা করা হয়, দেবীলক্ষ্মী যেন ঠিক ওইভাবেই ধনসম্পদের ভক্তকে ভরিয়ে রাখেন। কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে হওয়া এই লক্ষ্মী পুজোর মূল মন্ত্র হলো -

''নমামি সর্বভূতানাং বরদাসি

হরিপ্রিয়ে
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানৎ
সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চনাৎ।।''

অর্থাৎ, 'হে হরিপ্রিয়ে, তুমি সকল প্রাণীকে বরদান করিয়া থাক, তোমাকে প্রণাম করি। যাহারা তোমার শরণাগত হয়, তাহদের যে গতি, তোমার পূজার ফলে আমারও যেন সেই গতি হয়'। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর মূল প্রসাদ হলো নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিড়ে ও মুড়ির মোয়া, লুচি-সুজি, পায়েস, খিচুড়ি-তরকারী, এছাড়াও খই-মুড়কি, খেলনা, মিষ্টি ও নানান ফলপ্রসাদ ইত্যাদি। পূর্ব বাংলার নিয়মে অনেক বাড়িতে ওই দিন আবার জোড়া ইলিশ এমনকি মাছের পাঁচটি ভিন্ন ধরনের পদও রান্না হয়ে থাকে। আবার পশ্চিম বাংলার নিয়মে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন সম্পূর্ণ নিরামিষ রান্না হয়ে থাকে। এখন রোজকার ব্যস্ততার মধ্যে অনেক বাড়িতেই প্রতি বৃহঃস্পতিবার লক্ষীদেবীর পাঁচালি পড়তে না পারলেও, এই কোজাগরী লক্ষী পুজোতে প্রত্যেক বাড়িতেই পড়া হয়ে থাকে। অনেক বাড়িতেই আবার ওই দিন একই সাথে নারায়ণ পুজোও করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য পুজোর মতো এই পুজোতেও শাঁখ ও উলু ধ্বনি দিয়ে দেবীকে বরণ করা হলেও কোজাগরী লক্ষী পুজোতে কাঁসর ও ঘন্টা বাজানো হয় না। বলা হয়, কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ দেবী সহ্য করতে পারেন না, ফলে যে বাড়িতে কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে দেবার আরাধনা করা হয় লক্ষীদেবী অসন্তুষ্ট হয়ে সেই গৃহ ত্যাগ করেন।

সকল দেবদেবীর মতো লক্ষ্মীদেবীও তার বাহনকে সাথে নিয়ে মর্তে আসেন। তাঁর বাহন হলো পেঁচা। দেবীলক্ষ্মী অধিষ্ঠিত স্থান হলো ধানের গোলা, আর এই ধানের গোলায় থাকে ইঁদুর যারা ধান ও অন্যান্য শস্য ধ্বংস করে। এই পেঁচা সেই সকল ইঁদুর খেয়ে লক্ষ্মীদেবীকে রক্ষা করে বলেই, পেঁচা দেবীলক্ষ্মীর বাহন রূপে দেবীর সাথেই পুজিত হয়। দেবী যে কেবল কাঁসর-ঘন্টার শব্দে অসন্তুষ্ট হন এমনটা নয়, খাদ্য অপচয় করলেও দেবী রুষ্ট হন। শাস্ত্র মতে ভক্তদের প্রতি লক্ষ্মীদেবীর অন্যতম আর্শীবাদ হলো, ''আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'' অতএব খাদ্যের অপচয়ে দেবীলক্ষ্মী কুপিত হন।

সকল প্রকার আচার-আচরণ মেনে এইবারের কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোতে সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হোক এবং সকলেই ধনসম্পদে ভরে উঠুক এই প্রার্থনা রইল।

প্রাথমিক চিকিৎসায় বাড়িতে ভেষজ উদ্যান

Dr. Samarjit Ghatak, B.A.M.S. (Calcutta University)

বাড়িতে জায়গার মাপ অনুযায়ী বেশ কিছু ভেষজ গাছপালা আমরা লাগাতে পারি। সময়-সময় সেইগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করলে বিনা খরচে ছোটখাটো শারীরিক সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবো। এগুলি প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনার অনেক কাজে লাগবে। বাড়িতে যে ভেষজ গাছগুলি সহজে লাগানো যায় তাদেরকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা হল-

বেড়া বা পার্টিশান হিসাবে

মেহেন্দি, কারিপাতা, তুলসী, বাসক এইগুলি বাগানের ধার বরাবর বেড়া বা পার্টিশান হিসাবে লাগানো যেতেই পারে।

ছড়ানো বা Beds

পুদিনা, ব্রাহ্মী, দুর্বা, কালমেঘ, ভুঁই আমলা, সেন্ট্রোনিলা ইত্যাদি গাছ বেশ খানিকটা মাটিতে ছড়িয়ে থাকে। এদের জন্য একটু বেশি জায়গা দরকার হয়।

ছোট গুল্ম বা বৃক্ষ জাতীয় গাছ

নিসিন্দা, ডালিম, সজনে, পেঁপে, জবা, ইউক্যালিপটাস, এগুলি বাগানের শেষ প্রান্তে বা কোণায় লাগানো যায়। বেশি জায়গা থাকলে নিম, ছাতিম, মহুয়া, কুল গাছ লাগাতে পারেন।

লতানে ভেষজ

গুলঞ্চ, পিপুল, শতমূলী, গুড়মার, এগুলি কোন বড় গাছ বেয়ে উপরে উঠতে পারে। বাড়ীর পিলার বা দেয়ালে এরা বেয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজন হলে বাঁশের মাচা করে দিতে পারেন।

যাদের গাছ লাগানোর মতো জায়গা নেই তারা টবে ছোট ভেষজ গাছ যেমন - তুলসী, কালমেঘ, কারিপাতা, ঘৃতকুমারী ইত্যাদি লাগাতে পারেন।

বাড়িতে ভেষজ ব্যবহারের পদ্ধতি

স্বরস (ফ্রেস জুস)

গাছের ব্যবহার্য্য অংশ (মূল, পাতা ইত্যাদি) পরিষ্কার করে ধুয়ে পিষে নিন। একটি পরিষ্কার সুতির কাপড়ে ঐ বাটা ভেষজ নিয়ে তার রসটা চেপে বার করে নিন। ফ্রেস জুস সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে, ফেলে রাখা যাবে না। উদাহরণ - বাসক, তুলসী, পাথরকুচি ইত্যাদি।

চূর্ণ (পাউডার)

ব্যবহার্য্য ভেষজ রোদে শুকিয়ে নিন। শুকনো ভেষজ দ্রব্য গুঁড়ো করে, মিহি করে চেলে নিন। একটি এয়ার টাইড জারে রেখে নিন। প্রায় একবছর ভাল থাকবে। উদাহরণ - শতমূলী, বেল, নিম, অর্জুন ছাল ইত্যাদি।

কষায় বা ক্বাথ

শুকনো ভেষজ দ্রব্যকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ১৬ গুণ জলে মৃদু আঁচে ফোটাতে হবে। ১/৪ ভাগে জল অবশিষ্ট থাকবে আঁচ থেকে নামিয়ে ছেঁকে নিন। এটি ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ভাল থাকে। মাত্রা - ২০ থেকে ৩০ মিলি। উদাহরণ - বাসক, নিম, যষ্টিমধু।

ফান্ট (Hot infusion)

ছোট টুকরো করে কাটা বা গুঁড়ো ভেষজ এক গ্লাস গরম জলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। সকালে লিকার অংশটা ছেঁকে ব্যবহার করুন। উদাহরণ - চিরতা, মেথি, জিরে।

ভেষজ দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা -

অম্বল

১ চামচ গুলঞ্চের রস ১ কাপ জল সহ দিনে দুইবার ৭ দিন খালিপেটে খাবেন। ত্রিফলা চূর্ণ ১ চামচ ও মধু মিশিয়ে সেই মিশ্রণটা দিনে দুইবার দুই চামচ ভরা পেটে খাবেন।

গরম খাবার, তেলেভাজা, ঝাল মশলা বাদ দিন। একটানা ৭ দিনের বেশী অম্বল বা গ্যাস হলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কোষ্ঠা বধ্যতা

২ চামচ ত্রিফলা চূর্ণ রাতে শোয়ার সময় উষ্ণ জল সহ খাবেন। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে ল্যাট্রিন যাওয়ার অভ্যাস করুন। ব্যস্ততার কারণে কখনই পটি চেপে রেখে কাজ করবেন না। শাক-সবজি, গোটা ফল রোজ খাবেন। রাত জাগবেন না।

সাধারণ সর্দি-কাশি

১০ গ্রাম করে শুকনো আদা, পিপুল, মরিচ, তুলসী পাতা ও মিছরি ২ গ্লাস জলে ফুটিয়ে নিন। ১ গ্লাস অবশিষ্ট থাকতে ছেঁকে নিন। চায়ের মত চুমুক দিয়ে খান, দিনে ৩ বার।

১০ গ্রাম বাসক পাতা ও ১০ গ্রাম মিছরি ২ গ্লাস জলে ফুটিয়ে নিন। ১ গ্লাস অবশিষ্ট থাকতে ছেঁকে নিন। চায়ের মত চুমুক দিয়ে খান, দিনে ৩ বার। জমে থাকা কফ্ তরল করে বার করে দেবে।

জ্বর থাকলে কালমেঘ ও গুলঞ্চের রস ১০ মিলি (২ চামচ) করে দিনে ৩ বার খান। ঠান্ডা, ধুলো, ধোঁয়া এড়িয়ে চলুন। বেশীদিন কাশি বা জ্বর থাকলে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার দেখিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান।

সাধারণ কাটাছেঁড়া

ফটকিরি জলে গুলে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলুন। ঘৃতকুমারী পাতা, লজ্জাবতী পাতা, দুর্বা ঘাস ও কাঁচা হলুদ পরিষ্কার করে ধুয়ে পিষে ক্ষতস্থানে লাগান। দ্রুত হিলিং হবে। তবে পুরনো কোন ক্ষতস্থানে ব্যথা ও পুঁজ যুক্ত হলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।

ডায়ারিয়া বা আমাশা

২০ গ্রাম কুটজ বা কুরচী গাছের ছাল পরিষ্কার করে ধুয়ে ১ গ্লাস জলে ফুটিয়ে নিন। ১/৪ ভাগ অবশিষ্ট থাকতে ছেঁকে ঠান্ডা করে খান দিনে ২ বার। ৩ দিন চলবে।

ডালিমের রস ১/২ কাপ, ১/২ চামচ নুন, মিছরি দিয়ে দিনে ২ বার খান। অতিরিক্ত পায়খানা বা বমি হলে তখন মুখে ওষুধ (Oral Medicine) খেলে হবে না তখন স্যালাইন লাগবে। এক্ষেত্রে অবহেলা না করে জরুরী বিভাগে রোগীকে নিয়ে যান।

পুজোয় সুস্থ থাকার ১০টি হেলথ টিপস্

পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে গিয়ে নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যকে অবহেলা করলে তো পুজোটাই মাটি। তাই সুস্থ ও সুন্দরভাবে পুজো কাটানোর জন্য রইল কিছু হেলথ টিপস্।

পূর্ব ভারতে উদ্‌যাপিত বিভিন্ন পুজোপার্বণ ও উৎসবের মধ্যে দুর্গাপুজো উল্লেখযোগ্য। এই পুজোর জন্য বাঙালিরা বিশেষ করে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। পুজোয় সচরাচর বাঙালিরা ঘরে রান্না করে খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা এড়িয়েই চলতে ভালোবাসেন। বিভিন্ন প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি সুস্বাদু খাবারে রসনাতৃপ্তিই পুজোর তিনদিন বেশি পছন্দ করেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ। ওই তিনদিন বিভিন্ন বারোয়ারি পুজো প্যান্ডেল, ছোট-বড়ো হোটেল কিংবা রাস্তার পাশে তৈরি ছিমছাম ফুড কর্নারেই পেটপুজোয় মেতে ওঠেন সবাই। সুন্দরী ললনারা তাদের দেহবল্লরী বছরের অন্য সব দিনে যতই স্লিম ও অ্যাট্রাকটিভ দেখানোর জন্য মেপে খাওয়ার আদিখ্যেতা দেখান না কেন, পুজোর তিনদিন ক্যালোরির হিসেব ভুলে নানা মুখরোচক খাবার-দাবারে উদরপূর্তির সঙ্গে মনের আনন্দকেও দ্বিগুণ করে তুলতে মরিয়া হয়ে পড়েন। তবে পুজোর দিনগুলোতে মজা ও হুল্লোড় যতই হোক না কেন, উৎসবের আনন্দে নিয়মের বেচাল হলেই গন্ডগোল শুরু। ঋতু বদলের এই দিনগুলোতে একটু অসাবধানতাই ডেকে আনতে পারে অসুস্থতা। আর তা হলেই পুজোর সব আনন্দই মাটি। কিন্তু, যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে অনায়াসে শরীর ও মনকে চাঙ্গা রেখে উৎসবের দিনগুলো মন খুলে উপভোগ করা যাবে। পুজোর কটা দিন সুস্থ থাকার জন্য দেওয়া হল কিছু স্বাস্থ্য টিপস্।

অধিক মিষ্টান্ন

বাঙালিরা আদতেই মিষ্টি প্রিয়। উৎসবের মরশুমে হরেক রকমের মিষ্টিতে তাদের রসনা তৃপ্তি করা চাই-ই। কিন্তু ওজন কমানো নিয়ে, ক্যালোরি নিয়ে সচেতন হন, তাহলে রসগোল্লা ও সন্দেশ খাওয়ার বেলায় সতর্ক হতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির ভাঁড়ার গড়ে দেহের ভারসাম্য বিগড়ে দিতে পারে রকমারি মিষ্টিগুলো। তাই পুজোর সময় মিষ্টি খেতে চাইলে একটা বা দুটোর বেশি নয়। যদি পারেন, তাহলে সুগার ফ্রি মিষ্টি বেছে খাওয়াই ভাল। আজকাল অনেক দোকানেই এগুলো পাওয়া যায়।

কোল্ড ড্রিঙ্কস এড়িয়ে চলুন

কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ঠান্ডা পানীয় জিভের স্বাদের জন্য আরামদায়ক হলেও এতে দেহের মারাত্মক ক্ষতি হয়। কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস গুলোতে থাকা ট্রান্স ফ্যাট লিভার ও কিডনির জন্য যেমন মারাত্মক, তেমনি এটি ধীরে ধীরে শরীরের ধমনী গুলোতেও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। যাদের ডায়াবেটিস আছে, তাদের জন্য তো এই কার্বোনেটেড ঠান্ডা পানীয় বিষতুল্য।

পুজোর দিনগুলোতে ডায়াবেটিস রোগী থেকে শুরু করে সাধারণ লোকেরা কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস পরিহার করে যদি লেবুর জল বা ডাবের জল সেবন করেন, তাহলে তারা সফট ড্রিঙ্কসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে থাকবেন।

ব্যায়াম চলুক নিয়মিত

পুজোর দিনগুলোতে মজা-আনন্দ করার জন্য ব্যায়াম বাদ দেওয়া চলবে না কোনভাবেই। অন্তত দিনে আধঘন্টা ব্যায়াম করতেই হবে। শরীরে জমা অতিরিক্ত ক্যালোরি জ্বালিয়ে দেহের ভারসাম্য সঠিক রাখতে ব্যায়ামের বিকল্প নেই। তাই ব্যায়াম ছেড়ে শুধুমাত্র উদরপূর্তিতে মগ্ন হলে চলবেনা একদমই।

জলই জীবন

জল থেকে শরীর যেমন তার দরকারী পোষকতত্ত্ব পায়, তেমনি জল শরীরে জমা ক্ষতিকারক টক্সিন বের করতেও সাহায্য করে। তাই পুজোর মরশুমে সুস্থ থাকতে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত জল পান করুন।

সবুজ শাক-সবজি অবশ্যই

পুজোর দিনগুলোতে শরীরকে সুস্থ ও তরতাজা রাখতে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রচুর সবুজ শাক-সবজি রাখুন। ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিনের উৎস এই শাক-সবজি শরীরকে সবল রাখবে ও অনেকটা সময় পর্যন্ত পেট ভর্তি রেখে কাজ করার শক্তি জোগাবে।

বেরোনোর আগে খান

যদি বাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে বেরোন, তাহলে খিদে বেশি পাবে আর খাবার সময় স্বাভাবিকভাবেই বেশি খাবেন। কিন্তু যদি কম সময়ের ব্যবধানে অল্প-অল্প খাবার গ্রহণ করা যায়, তাহলে খিদে নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং খাদ্যগ্রহণও বেশি হবে না।

রাতে হালকা খাবার খান

দিনে ঠাকুর দেখা বা ঘোরাঘুরির সময় পেট ভরা খাবার খান। কারণ, দিনে ঘোরাঘুরির সময় হজম ভাল হবে। কিন্তু রাতে হজমশক্তি কম হয়ে পড়ায় হাল্কা খাবার খেলে হজমে সমস্যা হবে না। শরীরও সুস্থ থাকবে।

ওষুধপত্র সঙ্গে রাখুন

পুজোয় বেরোনোর সময় দরকারী ওষুধপত্র বা মলম সঙ্গে রাখুন। দরকার পড়লে ব্যবহার করা যাবে। নিরাপদে পুজো দেখতে এগুলো প্রয়োজনীয়।

মোবাইল রাখুন সচল

মোবাইল আজকের যুগে অসম্ভব দরকারী, প্রয়োজনীয় মোবাইল নম্বরের লিস্টও সাথে রাখুন। বলা যায় না কখন দরকার হয়। মোবাইল চার্জ ঠিকঠাক আছে কিনা, সেটাও দেখে নিন সময় মতো।

ছোট প্লেট নিরাপদ

ছোট ছোট প্লেটে খাবার খেলে বেশি খাবার খাওয়ার প্রকৃতিটা দমন হয়। তাই বড় প্লেটের চেয়ে ছোট ডিশে খাবার অভ্যাস করুন উৎসবের মরশুমে। এতে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পাবে। ওজনও থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

পুজোর আনন্দে মাততে হলে দেহ থাকুক সুস্থ ও মন থাকুক চাঙ্গা। এজন্যই এই উৎসবের দিনগুলোতে মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ রাখুন। নেশার দাস না হয়ে, সবাই মিলে মাতৃ আরাধনার আনন্দ উপভোগ করুন মন খুলে।

গাঁটের ব্যথায় অব্যর্থ হোমিওপ্যাথি

ডাঃ রোমি শী

বয়স্ক মানুষ গাঁটের ব্যথায় ভুগছেন না এই রকমটা খুব কম দেখা যায় আজকের দিনে।

শুধু বয়স্করা ভুগছেন তা নয়, যুবপ্রজন্মও আজকাল গাঁটের ব্যথার শিকার হচ্ছে। সেদিন বাজারে দেখা হল সোমনাথ জেঠুর সাথে। পায়ের ব্যথায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাজারের থলে হাতে বাড়ি ফিরছেন। আগে লোকটাকে কত পরিশ্রম করতে দেখেছি। ছেলে ভালো চাকরী পাবার পর জেঠু পরিশ্রম করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিলাসবহুল জীবনে ঘরে বসে থাকা ছাড়া কোনো কাজই ছিল না জেঠুর। বাড়তে শুরু করেছিল দেহের ওজন। তার সাথে জেঠুর অ্যালকোহল পানের অভ্যাসও ছিল। যার ফলস্বরূপ আজকের এই ব্যথা।

গাঁটের ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন-

➢ দুটো হাড়ের সন্ধিস্থলে যদি হাড়ের ক্ষয় হয়।

➢ সন্ধিস্থলের যে তরল পদার্থটি হাড়কে বিভিন্ন পাশে ঘোরাতে সাহায্য করে সেটা যখন কমে যায় তখন দুটো হাড়ের মাঝে ঘষা লাগে, ফলে ব্যথা অনুভূত হয়।

এই সমস্যাগুলো সাধারণত অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অত্যধিক দেহের ওজন বৃদ্ধির জন্য হয়।

➢ হাড়ের সন্ধিস্থলে ধারালো ক্রিস্টাল জমা হওয়া। অতি নিউরিন যুক্ত খাবার (রেড মিট, চিকেন, পর্ক, সামুদ্রিক মাছ, অ্যালকোহল, বিয়ার) আমাদের শরীরে পরিপাকের পর বর্জ্য পদার্থ হিসাবে ইউরিক অ্যাসিড মূলত মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। কিন্তু অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড হাড়ের সন্ধিস্থলে ক্রিস্টাল আকারে জমা হয়। ফলে গাঁটের ব্যথা অনুভূত হয়। গাঁটগুলো লাল হয় এবং ফুলে থাকে।

নিরাময়ের উপায়

হোমিওপ্যাথি এই গাঁটের ব্যথা সারাতে খুব ভালো কাজ করে এবং কোনো রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া। হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ সিলেকশন্ করা হয় রোগীর লক্ষণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, দু'জন এক বয়সের ব্যক্তির গাঁটের ব্যথা মানেই দু'জনের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সিলেকশন্ এক হবে তা নয়। এক জনের হয়তো বসে থাকলে ব্যথাটা বেশি বলে মনে হয়, তার যা ওষুধ সিলেকশন্ হবে, অন্যজন যার বসে থাকলে ব্যথাটা কম বলে মনে হয় তার ক্ষেত্রে অন্য ওষুধ সিলেক্ট করা হয়। খুব সুক্ষ সুক্ষ লক্ষণের উপর নির্ভর করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সিলেকশন্। গাঁটের ব্যথার জন্য মূলত যে ওষুধ সমূহ ব্যবহার করা হয়, তা হলো আর্নিকা মন্টেনা, ব্রায়োনিয়া, রাস্ টক্স, বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড, রেডিয়াম ব্রোম, লিথিয়াম কার্ব, লিডাম পাল্, মেডোরিনাম ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক অনেক ওষুধ আছে।

গাঁটের ব্যথা কমানোর টিপস্

- ধীরে ধীরে ডায়েটের মাধ্যমে অত্যধিক দেহের ওজন কমাতে হবে।
- প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩ লিটার জল পান করতে হবে।
- রেডমিট, চিকেন, পর্ক, সামুদ্রিক মাছ কম খেতে হবে।
- সতেজ ফল ও সবজি খেতে হবে।
- অ্যালকোহল, বিয়ার পান ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এতো দিনের অভ্যাস সহজে কি ছাড়া যায়। তাই রোজ খাওয়ার পরিবর্তে মাঝে মধ্যে যতটা কম খাওয়া যায় ততটাই ভালো।

কী! আপনিও ভাবছেন যে, অনেকদিন তো হলো গাঁটের ব্যথায় ভোগা আর স্টেরয়েড নিয়ে ব্যথা কমানো এবং যার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে আপনার শরীরে। তাহলে বলি, গাঁটের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে এবার হাত ধরুন হোমিওপ্যাথির। তবে হ্যাঁ, দয়া করে নিজে নিজে কোনো ওষুধ কিনে খাবেন না। অবশ্যই কোনো ভালো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই ওষুধ খাবেন।

যোগাযোগ- **8777295006**

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিহেভিয়ারাল সায়েন্স-এর পক্ষে ডা. কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পি-৭ সি আই টি রোড, মৌলালি, কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে 'অ্যাঞ্জেল' প্রকাশিত ও মুদ্রিত ● মধুরিমা প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ● ফোনঃ ২২৮৬-৭০৩৮, E-mail: angelpublishers@gmail.com ● **সম্পাদক ঃ কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** ● RNI No. WBBEN/2009/34317